OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 15
Website: https://tirj.org.in, Page No. 120 - 129
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 120 - 129
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

আধুনিক বাংলা কবিতায় নারীর কবিতার বিবর্তন : গীতা চট্টোপাধ্যায়ের স্বাতন্ত্র্য

তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রাক্তন ছাত্র, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : banerjeemandira09@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Woman, Feminism, Position of women in society, Women under house arrest, Women's feelings, Women's individuality, The multidimensional woman.

Abstract
In ancient Indian tradition, women were considered as goddesses. In various scriptures, that woman was considered to be the receiver of maternal power. Who holds the child in the womb and grows it little by little and shows the light of the world. Women are not satisfied only with giving birth to children. Despite doing all the work in the world, their foreheads are scroned and humiliated. Patriarchal society tends to continuously opperss women. But the eyes of man and woman are not afraid and move forward. Some of them are women who use their writing and speech as a language of protest. This trend has continued since the thirties till the present time. Kamini Roy, Man kumari Basu, Kusumkumari Das are among the women poets who entered the world of poetry in the early thirties. Although the language of their poetry is not strong, the history of the life of married women has been revealed in their writtings. Later the voice of women poets changed from the 1950's onwards. Poet Kabita Singh of the 50's, Mallika Sengupta of the 70's has a strong tone of poetry. What the have observed in their personal experience in the surrounding life is represent in the poem. The social positions of women observed by them at that time resulted in short puns and insults in the poem. On the other hand, in the poetry of poet Chaitali Chattopadhyay or Sutapa Sengupta of the 1980's we find a different view of women. Altho the language of their poetry is not intense the individual needs of women have been caught repeatedly. But 60's poet Geeta chattopadhyay's language, of protest is distinct from others. As she was born into a conservative sophisticated family, her writings reveal a different picture of the antapur women. Not only the women's life of antapur, she has established the multi dimensional aspects of women with her own creative power. The confined life of housewives, individual physical feelings etc. Masculinity is not always performed by men but also by women as we often find such instances in various poems of poets. Her protest language is very mild yet effective. It is her gentle manner of speaking as well as deep thoughtfulness that gives life to her poetry. To understand her poems,

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 15
Website: https://tirj.org.in, Page No. 120 - 129
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

one has to dive deep into the heart. The poet's protest is expressed without using any raised tone. This has emerged prominently in the discussion.

Discussion

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এমন একটি সময় ছিল যখন নারীরা দেবীর মর্যাদা লাভ করত। আমাদের বিভিন্ন শাস্ত্র গ্রন্থাদিতে নারীর মধ্যেই সেই আদিশক্তি পরমা প্রকৃতির রূপকে কল্পনা করেছেন মুনি-ঋষিরা। যার নিদর্শন হিসাবে বিভিন্ন স্তব-স্তুতির উল্লেখ আমরা পাই। কিন্তু সভ্যতা যত এগোতে থাকল, আমরা যত বিজ্ঞানমনস্ক-আধুনিক হতে থাকলাম, তখন থেকেই নারীর অবস্থান বদলে গেল সমাজে তথা সংসারে। সেই সময়ে মানব সভ্যতা বলতে কেবলমাত্র পুরুষের কথাই বলা হত। নারীর অবস্থান পুরুষেরই মাপকাঠিতে বিচার্য হত। নারীদের আলাদা কোনো পরিচয় নেই, নেই কোনো ইতিহাস। সমাজের যা কিছু নেতিবাচক, কুৎসিত দিক সেইসব কিছু দিয়েই 'শরীরিণী'[১] নারীকে গড়ে তোলা হত। পুরুষের কাছে নারীদেহ কাম্য, উপভোগের সামগ্রী তাই নারী হল কামিনী। নারীর দ্বারা পুরুষের চিত্তবিভ্রম ঘটে, ব্রহ্মচর্য নষ্ট হয় তাই নারী পরিত্যাজ্য। কিন্তু সমাজ বা সংসারে নারীরাই গর্ভস্থ ভ্রূণকে রসদ জুগিয়ে একটু একটু করে বড়ো করে তুলে পৃথিবীর আলো দেখায়। আবার নারীর অভাবে একটি সংসারও অসম্পূর্ণ। এই নারী কখনও মাতা, কখনও বধূ, কখনও প্রিয়তমা। পুরুষের নান্দনিক বোধে তিল-তিল করে তিলোত্তমা হয়ে ওঠে নারী। কবিদের মধ্যে শার্ল বোদলেয়ারের 'স্তোত্র' কবিতার বুদ্ধদেব বসু কৃত অনুবাদে এই একই উচ্চারণ ধ্বনিত হয় –

> "প্রিয়তমা সুন্দরীতমারে
> যে আমার উজ্জ্বল উদ্ধার
> অমৃতের দিব্য প্রতিমারে
> অমৃতেরে করি নমস্কার।"[২]

সমাজের নানা যন্ত্রণার প্রতিরোধ ও ভাষাহীন অন্ধকারকে ভেদ করে নারীরা ধাপে ধাপে প্রতিবাদীনী হয়ে উঠেছে। প্রথম দিকে অর্থাৎ যখন নারী কবিদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে তখন প্রতিবাদের মাত্রা তীব্র না হলেও পরবর্তী সময় যত এগিয়েছে তাদের কণ্ঠও তত জোরালো হয়েছে। নারীদের কবিতা লেখার বিষয়টিকে তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজ মেনে নেয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা পুরুষতন্ত্রের গড়ে তোলা কিছু অনড় ধারণা, সংজ্ঞা এবং সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করে গড়ে তুলেছেন নারীচেতনার সন্দর্ভ, নান্দনিক বোধ এবং জীবনসত্যকে।

গীতা চট্টোপাধ্যায় ছয়ের দশকের নারী কবি। তিনিই প্রথম পথপ্রদর্শক নন। তার পূর্বেও কবিতা চর্চার একটি সুদীর্ঘ পথ রয়েছে। তিনের দশক থেকে শুরু করে অর্থাৎ ১৯২০-১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিভিন্ন নারী কবিরা কবিতার জগতে পদার্পণ করেছেন। সেই সময়ের নারীদের থেকে পাঁচ কিংবা পরবর্তী দশকের নারীদের কবিতার ধরণ সম্পূর্ণ পৃথক। ১৯২০-৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যারা কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম কামিনী রায়, মানকুমারী বসু, কুসুমকুমারী দাশ। তাঁরা প্রত্যেকেই পরিবার জীবনে আবদ্ধ নারী। এদের জীবন ছিল অন্তঃপুরকেন্দ্রিক ফলত তাঁদের লেখার মধ্যে স্বামী-সন্তানের কথা, প্রেমের কথা, গৃহকেন্দ্রিক জীবনের কথা এগুলিই বারবার উঠে এসেছে। কিন্তু পরবর্তীতে পাঁচের দশকের নারীদের স্বর পূর্ববর্তী নারী কবিদের থেকে পৃথক। পাঁচের দশকের নারীরা শুধুমাত্র গৃহজীবনে আবদ্ধ নন। তারা দীর্ঘদিন যাবৎ সংসার চক্রে নিপীড়িত হতে হতে জীবনের ঘাত প্রতিঘাতকে সহ্য করতে করতে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছেন। ফলত তাঁদের স্বর তীব্র এবং প্রতিবাদের ধরণও জোরালো।

পাঁচের দশকের নারী কবিদের মধ্যে অন্যতম কবি কবিতা সিংহ। যিনি এই নিপীড়নের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন তাঁর 'অপমানের জন্য ফিরে আসি' কবিতায়। কবিতার মধ্যে তিনি বলতে চেয়েছেন জোরালো কণ্ঠে, যে নারীরা অপমানের জন্য বারবার ফিরে আসেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীদের শুধুমাত্র কলঙ্ক, অপমান ছাড়া কিছুই দিতে সক্ষম নয়। তবুও সেই কলঙ্কের বোঝাকে উপেক্ষা করে পুরুষতন্ত্রকে উপেক্ষা করে নারীরা এগিয়ে চলে আপন মহিমায়। কিন্তু কখনোই নারীরা পুরুষের দয়া-দাক্ষিণ্যের প্রত্যাশা করেন না। আবার 'ভ্রূণা' কবিতাতেও আমরা দেখতে পাই সমাজের প্রতি কবির

তীব্র শ্লেষ। একটি গর্ভস্থ ভ্রূণ যে এখনও পর্যন্ত পৃথিবীর আলো দেখতে পায়নি সেও এই বন্ধ্যা সমাজে জন্মগ্রহণ করতে চায় না। তাই মাতৃজঠরে থাকা অবস্থায় মা'কে বলে যাতে তিনি জন্ম না দেন এই পৃথিবীতে, কারণ সমাজে নারীরা অবাঞ্ছিত। তাই শেষ পর্যন্ত কবি কণ্ঠে ধ্বনিত হয় –

"গেরস্তের ঘরে ঘরে
খোকা হোক! খোকা হোক! শুধু খোকা হোক!"[৩]

নারীদের স্বরের তীব্রতা যখন বৃদ্ধি পায় তখন পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তাদের অবদমিত করতে চেষ্টা করে। ফলত কিছু দুর্বল চিত্তের অধিকারী নারী যারা সেগুলিকে মেনে নেয়। আবার কিছু নারীরা প্রতিবাদে গর্জে ওঠে। ছয় দশকের কবি দেবারতি মিত্র, সাতের দশকের কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানায়। অপরদিকে আটের দশকের কবি সুতপা সেনগুপ্ত, চৈতালী চট্টোপাধ্যায় এদের কবিতার স্বর তথা দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক।

সাতের দশকের কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত তাঁর 'ছেলেকে হিস্ট্রি পড়াতে গিয়ে' কবিতায় বলেছেন 'হিজ স্টোরি' অর্থাৎ আমাদের প্রাচীন ইতিহাসে শুধুমাত্র পুরুষদের জয়যাত্রার কথাই উল্লেখ রয়েছে। কারণ 'হিস্ট্রি' থেকে আমরা 'জাভা ম্যান', 'নিয়েনডার্থল ম্যান', 'স্টোন এজ ম্যান', 'প্যালিওলিথিক ম্যান'-এর কথা জানতে পেরেছি। সেখানে কোন নারীর (Woman) উল্লেখ আমরা পাইনি। কবিতার শেষে কবি শ্লেষের ভঙ্গিতে বলেছেন জাভা পুরুষের গর্ভে পুরুষের জন্ম হয়েছিল। অর্থাৎ পুরুষই পিতা, মাতা। এখানে নারীর কোন ভূমিকা ছিল না -

"পুরুষ একাই ছিল ভগবান আর ভগবতী
পুরুষ জননী ছিল পুরুষজনক
পুরুষ স্বয়ং সুর এবং বাঁশরি
পুরুষ স্বয়ং লিঙ্গ এবং জরায়ু
আমরা হিস্ট্রি থেকে এরকমই জানতে পেরেছি..."[৪]

আটের দশকের কবি চৈতালী চট্টোপাধ্যায় তিনি অগ্রজ কবিদের মতো জোরালো প্রতিবাদ করেননি। তিনি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমাজ তথা পরিবেশকে পর্যবেক্ষণ করেছেন পরবর্তীতে সেগুলিই তার কবিতার বিষয় হয়ে উঠেছে। চৈতালি চট্টোপাধ্যায়ের 'সতী' কবিতায় আমরা বেহুলার প্রসঙ্গ পাই। বেহুলাকে আমরা সতী বলে থাকি কিন্তু সেই বেহুলাই আবার তাঁর মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্য ইন্দ্রের সভায় সমস্ত দেবতাদের সামনে নৃত্য প্রদর্শন করেছিলেন অর্থাৎ তাঁর সতীত্ব বিক্রি করে তিনি স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে এনেছিলেন। অথচ সমাজের চোখে তিনি সতী। এখানে আমাদের পৌরাণিক ঐতিহ্যের অন্তঃসারশূন্যতা প্রকাশ পাচ্ছে। যে নারী জনসমক্ষে অঙ্গ প্রদর্শন করেছেন তিনি নাকি আবার সতী। কারণ উদ্দেশ্য যেহেতু মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরিয়া আনা তাই ঐতিহ্য জলাঞ্জলি গেলেও কোন ক্ষতি নেই। সমাজে পুরুষের অপকর্ম ঢাকতে নারীদেরই বারবার হাঁড়িকাঠে গলা দিতে হয়। যার দৃষ্টান্ত আমরা 'একটি হত্যাকাণ্ডের পর' কবিতায় আমরা পাই। স্টোভ বার্স্ট করে একজন মহিলার মৃত্যু হয়েছে। সাধারণ মানুষের চোখে সেটি দুর্ঘটনা বলে মনে হলেও আসলে সেটি একটি পরিকল্পিত হত্যা—

"গুচ্ছ অপরাধ বোধ, পোড়া গন্ধ, আত্মীয়-স্বজন...
পুলিশ তদন্ত সেরে ফিরে গেলে, আজ
তোমার ও লোকটির গোপন সম্পর্ক - কথা পল্লবিত হবে।"[৫]

আটের দশকের অপর এক কবি সুতপা সেনগুপ্ত তিনিও তাঁর কবিতার মধ্যে আধুনিক নারীর জীবনের বিভিন্ন চাহিদাকে তুলে ধরেছেন। তাঁর 'ছোকরা ছোকরা শ্যাম রায়-বাই' কবিতায় একজন আধুনিকা একাকীনি নারীর কথা বলা হয়েছে। তিনি ট্রেনে নিত্যদিন যাতায়াত করেন। ট্রেনে যাতায়াতের সময় তার পিঠে যখন একজন পুরুষের স্পর্শ অনুভূত হয় সেটিকে তিনি উপভোগ করেন। তার শরীর ক্ষুধার্ত জীবনে জীবনসঙ্গী নেই। তাই পুরুষের স্পর্শের মধ্য দিয়ে তার চাহিদার নিবৃত্তি ঘটছে। ওপর একটি কবিতা 'প্রাকৃত' যার মধ্যে কবি একজন নারীর অসামাজিক প্রেমকে তুলে ধরেছেন। ভারতীয়

সমাজ ব্যবস্থা অনুযায়ী একজন পুরুষ-নারী বিবাহ ছাড়া একসঙ্গে থাকতে পারে না। কিন্তু কবি কবিতার মধ্যে একটি বাধ্য-বাধকতাহীন সম্পর্কের কথা বলতে চেয়েছেন। সম্পর্কটি ‘বালির ঘরের’ মতো হবে অর্থাৎ ইচ্ছে হলে সেই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসা যাবে। সেখানে থাকবে না কোনো সামাজিক স্বীকৃতি।

“বিবাহে বিশ্বাস নেই, জানাই প্রস্তাব
এসো যেন কাঁকড়ার মত দুইজন
খোলা আকাশের নীচে উদ্যত মিলনে
যে যার খোলের ছিলা খেলায় নির্জন।”[৬]

কবি সুতপা সেনগুপ্তের কবিতায় নারীর আধুনিক ভাবনা, স্বতন্ত্র সম্পর্ক ভাবনা, স্বতন্ত্র যৌন চেতনা প্রভৃতি প্রকাশ পেয়েছে। পাঁচের দশকের কবিতা সিংহ, সাতের দশকের মল্লিকা সেনগুপ্ত খুব জোরালো গলায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। অপরদিকে চৈতালি চট্টোপাধ্যায় বা সুতপা সেনগুপ্ত এদের প্রতিবাদের ধরণ তীব্র না হলেও ভিন্ন। কারণ তাঁরা নারীর চাহিদার দিকটিকেই বারবার তুলে ধরেছেন কবিতায়। কিন্তু এদের মধ্যে ছয়ের দশকের কবি চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবাদের স্বর খুবই মৃদু। তাঁর সমসাময়িক সময়ে যে সকল কবিরা কবিতা লিখেছেন তাঁদের থেকে তিনি সম্পূর্ণ পৃথক। তাঁর রচনায় বাংলার ঐতিহ্য-সংস্কৃতি বেশি মাত্রায় ধরা পড়েছে অন্যান্য দিকে তুলনায়। গীতা চট্টোপাধ্যায় তাঁর অগ্রজ- অনুজ কবিদের মতো তীব্রভাবে প্রতিবাদ না জানালেও তার যে মৃদু বাচনভঙ্গি যা পরবর্তীতে কার্যকরী হয়ে উঠেছে।

রক্ষণশীল অভিজাত পরিবারের কন্যা গীতা চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ষাটের দশকের একজন ব্যতিক্রমী কবি। পারিবারিক নিয়মকানুনের বোঝা তাঁর উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে পরিবার। কারণ তৎকালীন সময়ে মেয়েদের নানারকম প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হত, সেটা বাইরে হোক কি পরিবারের মধ্যে। সমস্ত কিছু সহ্য করার দায় একমাত্র মেয়েদেরই। মায়ের হাত ধরেই প্রথম তিনি শিক্ষাঙ্গনে পা দেন। সাবেকি পরিবার প্রথমে এগুলি মেনে নেয়নি। পরবর্তীতে পিতা এবং মাতার যৌথ উদ্যোগে তাঁর বিদ্যাচর্চা শুরু হয়। প্রথমে লেডিব্রেবোর্ন কলেজ থেকে স্নাতক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। রক্ষণশীল পরিবারে জন্মগ্রহণের ফলে বহির্বিশ্বের সঙ্গে তা যোগাযোগ স্থাপন হয়নি। কিন্তু তাঁর সংবেদনশীলতা, মনীষা প্রভৃতি তাকে ঘরে বসে বাইরের বিশ্বকে অন্তরে উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছিল। এই উপলব্ধির ফলস্বরূপ কবিতাগুলি হয়ে উঠেছে জ্বলন্ত আখর।

ছেলেবেলায় পিতা বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের কাছে সংস্কৃত শাস্ত্রচর্চার প্রতি আগ্রহ লাভ করেন এবং মাতা মাধবীলতা দেবী তাঁকে স্বদেশ সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসার অনুভূতি হৃদয়ে সঞ্চারে সাহায্য করেন। লেখিকা তাঁর মামারবাড়ি থেকেও নানা সংস্কৃতি মূলক চর্চার অনুরাগ লাভ করেন। পারিবারিক মহলেই নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন, লৌকিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে তাঁর জীবন প্রবাহ চলতে থাকে অঙ্কুরের মতো ছোট চারা গাছটি ক্রমে ক্রমে মহীরূহ হয়ে উঠতে থাকে। রক্ষণশীল অভিজাত পরিবারের বেড়ে ওঠার কারণে তৎকালীন সময়ে সমাধিকতা সংসারে নারীদের করুণ চিত্র তাঁর কবিতায় ফুটে ওঠে। তিনি শুধুমাত্র একজন নারী কবি নন। নারী-পুরুষের উর্ধ্বে এক স্বতন্ত্র সত্তা –

> “যখন আমি লিখি তখন আমি না-পুরুষ অথবা নারী-পুরুষ উভলিঙ্গ। পুরুষ জাতির প্রতি আমার কোনও আক্রোশ বা আক্রমণ নেই। তাঁরা আমার সহযাত্রী বা সহযোদ্ধা।”[৭]

গীতা চট্টোপাধ্যায় ছিলেন প্রচার বিমুখ কবি। আজীবন তিনি অন্তরালবর্তীনী থেকেছেন। এই অন্তরালে থাকার মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর সাধনা চালিয়ে গেছেন। লেখিকার কাছে শিল্প এবং ব্রহ্ম একই। শিল্প হবে আবহমান কালের, চিরন্তনের। কবি ঐশ্বর্য, লোক লস্কর, সুন্দরী রমণী এমন কি কবিতাকেও তিনি চান না। তিনি জন্মে জন্মে তাঁর পরমারাধ্য গোবিন্দকেই চান।

> “আমি চাই জন্মে জন্মে তোমায় অহেতুক ভক্তি, গোবিন্দ। আমার কাছে কিন্তু কবিতাই গোবিন্দ গোবিন্দই কবিতা।”[৮]

ভগবদ্ গীতার ভাষায় –

“যং লব্‌ধ্বা চাপরং লাভং

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 15
Website: https://tirj.org.in, Page No. 120 - 129
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মন্যতে নাধিকং ততঃ।"[৯]

যে জ্ঞান অর্জিত হলে আর নতুন করে কোনো কিছু পাওয়ার ইচ্ছে থাকে না গীতা চট্টোপাধ্যায়ের কাছে কবিতা তদ্রূপ। তাঁর কবিতা শুধুমাত্র ছয়ের দশকেই নয় বর্তমান কাল পর্যন্ত মানুষের হৃদয় এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এদিক থেকে তিনি একজন কালোত্তীর্ণা লেখিকা। যেমন তাঁর ভাষা বুনন সেরকমই তাঁর শব্দচয়ন। তিনি কখনো এক পাক্ষিক দৃষ্টিতে সমাজকে দেখেননি, ফলত সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের কথাই তাঁর রচনায় উঠে এসেছে এবং সেগুলি হয়ে উঠেছে সর্বস্তরের মানুষের জীবন দলিল।

কলকাতার রক্ষণশীল বনেদি পরিবারে বেড়ে ওঠার কারণে সমাজ সংসারে নারীদের যে চিত্র সেটি তাঁর কবিতায় বারবার ফুটে ওঠে। সংসারে সকলের সব রকম ফরমাশ, দাবি মেটানোর পরও নারীদের যে অপ্রাপ্তি সেগুলি কবিতায় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। নতুন লিখতে শেখা অন্তঃপুরবাসিনী বালিকার ভাষা কেমন ছিল সেটি কবিতায় জীবন্ত রূপ লাভ করেছে। বাক্য গঠনেও তিনি এনেছেন পুরাতনের আবহকে। ১৩০৫ বঙ্গাব্দের বাঙলাদেশ 'কর্তার ঘোড়া দেখে রাসসুন্দরী' কবিতাটি একান্ত ভাবে মহিলা শব্দ ভান্ডারে পরিপূর্ণ– 'জোনাকি কাঁটার খোঁপা', 'ঘোমটার মায়াবী সুতো', 'বকুলফুলেরা জানে'। আলোচ্য কবিতায় পুরুষতন্ত্র, পুরুষের যৌন আধিপত্য, উনিশ শতকে নারীর সামাজিক অবস্থান তির্যকভাবে বর্ণিত হয়েছে–

"স্তিমিত রাত্রির খাটে ঘনবর্ষা পিছল দর্শন–
জোনাকিকাঁটার খোঁপা, শেষে আলো, তাও নির্বাপণ!
ঝিঁঝির অস্পষ্ট দেহ শব্দময় হবে কত আর
কোরা শাড়িটির সুখ আতরের লজ্জায় মরেছে।"[১০]

এমন একটা সময় ছিল যখন নারীরা ছিলেন অন্তরালবর্তীনী। আলোচ্য কবিতাতে কর্তাকে নয়, কর্তার ঘোড়াকে দেখা মাত্র ঘোমটা দেওয়ার প্রসঙ্গের উত্থাপন ঘটেছে। কর্তার সঙ্গে রাত্রে শয্যাতে দেখা হয়েছিল। প্রকাশ্য আলোয় কর্তাকে দেখার সুযোগ কোনোদিন হয়নি নারীর -

"কর্তার ঘোড়ার সামনে কী করে বা যেতে পারে নারী...
আমি যে দেখিনি তাঁকে কখনো রৌদ্রের দুঃসাহসে।"[১১]

অন্তরালবর্তী নারীরা বাড়ির বাইরে বেরোনো তো দূরের কথা উঠোনে অর্থাৎ বাহিরমহলে যাওয়ার কোনো অধিকার দেওয়া হত না। মনে করা হত নারীরা শুধুই গৃহের অভ্যন্তরে থাকবে আর সকলের সময়মতো দাবি মিটিয়েই চলবে, বিনিময়ে জুটবে অবজ্ঞা, লাঞ্ছনা। এত কিছু সহ্য করেও নারী হয়ে ওঠেন গৃহকর্ত্রী। তাদের ছাড়া সংসার অসম্পূর্ণ, তবুও সমাজ তাদের সংসারে কতটা গুরুত্ব-ভূমিকা সেটি স্বীকার করতে নারাজ। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে নৈকট্যর পরিবর্তে ছিল দূরত্ব। সবকিছুর বিনিময়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীদের উপর চালায় অত্যাচার। যার চিহ্ন নারীরা নিজেদের শরীরে বহন করে চলে কিন্তু সেই চিহ্নের কথা সমাজের কেউ জানাতে পারে না, জানার চেষ্টাও করে না।

"একী, কালশিরা- চিহ্ন গোপন রাখিস দেখি নীল শাড়ি বুকের আঁচলে?
–এ আমার আজন্মের অহংকার প্রিয়তম দাগ।"[১২]

তৎকালীন সময়ে মেয়েদের যে সামাজিক অবস্থান সেই অবস্থানের পিছনে পুরুষের যতটা ভূমিকা ছিল তার চেয়েও বেশি ছিল নারীদের ভূমিকা। সমাজের নারীরাই তাদের পরবর্তী প্রজন্মের ওপর তাদের নানা অপ্রাপ্তি, বঞ্চিত হওয়ার যন্ত্রণাকে চাপিয়ে দিত। যার ফলশ্রুতিতে নারীরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সংসারের বোঝা নিজের কাঁধে বয়ে নিয়ে বেড়ায়। 'শিল্পসত্য' কবিতাতেও আমরা দেখতে পাই মা তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দিচ্ছেন ছুঁচ-সুতো। অর্থাৎ সেই মেয়েটি সেলাই করতেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেলাই অর্থাৎ ছুঁচ-সুতোর রূপকে কবি সংসারের সমস্ত ছিদ্রকে জোড়া লাগানোর কথাই

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 15
Website: https://tirj.org.in, Page No. 120 - 129
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এখানে বলতে চেয়েছেন। সেই সবকিছুকে জোড়া লাগাতে গিয়ে রক্তপাত হয় হোক কিন্তু জোড়া লাগানোর ভার শুধুমাত্র নারীদেরই উপর। সেই সংসার রূপ ছুঁচ-সুতোর মধ্য দিয়ে তৈরী হয় জীবনশিল্প –

"মা দিলেন ছুঁচ, মা দিলেন সুতো
সেলাই করতে সে প্রতিশ্রুত
বুনে যায় ফুল সেই থেকে ছুঁচে
রুমালে বাগান জীবনশিল্প।
কখনো রক্তপাত ছুঁচ ফুটে
সেলাইয়ের তরল আগুনের ছিটে
রক্তের দাগ বাগানে, তা থাক,
নইলে হবে না সত্য শিল্প।"[১৩]

লিঙ্গবাদী সমাজে নারী যেহেতু নারী তাই তারা অপাঙক্তেয় ও নিরুদ্ধ কণ্ঠ, ঐ সমাজের সাহিত্যিক প্রতিবেদনে নারীর উচ্চারণ রুদ্ধ। নারীর যে জীবন নির্মাণ সেখানেও কবির শ্লেষাত্মক বাক্যের মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে নারীর অস্তিত্ব। শ্লেষাত্মক বাক্যের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে নারীর আলোছায়াময় জীবন। সেই জীবন মধুর থেকে বিধুর বেশি। এই বিধুরতাকে সঙ্গে নিয়ে নারীরা এগিয়ে চলে।

নারী জীবন যেন শুধুমাত্র অন্যের দাসত্বের জন্যই। নারী জন্ম হয়েছে সকলের বেগার খাটার জন্য। জন্মের পর পিতার, বিবাহের পর স্বামীর, বার্ধক্যের পর সন্তানের দাসত্ব করতে হয় নারীকে। ছোটবেলা থেকেই নারীকে শেখানো হয়েছে তার কাজ রান্নাবাটি এবং পুতুল খেলা। এছাড়া আর অন্য কোনো কাজ নেই। বিবাহের পর স্বামীর ঘরে গিয়ে শ্বশুর বাড়ির সকলের মন জুগিয়ে চলাই তার একমাত্র কর্তব্য। এই কর্তব্য কর্ম পালন করতে করতে অন্ধকারেই হারিয়ে যায় নারী। শৈশবে যতটুকু স্বাধীনতা থাকে বিয়ের পর সেই স্বাধীনতার পরিবর্তে শুধুই পরাধীনতার শৃঙ্খল। পরাধীনতার স্মারক হিসাবে শাঁখা, আলতা, সিঁদুর নারীদের সঙ্গী —

"'আর তুই পুতুল খেলবি?'
কপালে দিলেন লাল দাগা।
'আর তুই চৌকাঠ ছাড়াবি?'
হাতে দেন রাঙারুলি শাঁখা।
'ঘাটে গিয়ে দেরি হবে তোর?'
দুপায়ে আলতার রক্ত ডোর।
বেদনা আরম্ভ তারপরে
অন্ধকার শিল্পের ভেতরে।"[১৪]

সমাজে তথা সংসারে নারীদের গৃহশ্রমকে কেউই কোনো মূল্য দেয় না। গৃহশ্রম নারীরা না করলে সংসার পুরো অচল। তবুও পুরুষতান্ত্রিক সমাজ মনে করেন নারীদের জন্মই হয়েছে শুধুমাত্র গৃহশ্রমের জন্য। তারা ক্রমশ দাবি মেটানোর যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। সমাজের এই জড়তাকে কবি অবলোকন করেছেন, কিন্তু কখনও নিজের ধর্মকে ত্যাগ করেননি। যেটিকে সঠিক বলে মনে হয়েছে সেটিকেই সারাজীবন মান্যতা দিয়েছেন। তিনি নিজেই নিজের পরিত্রাতা হয়ে উঠেছেন। 'ধর্ম' কবিতায় কবি দেখিয়েছেন প্রয়োজনে আত্মবিসর্জন দেবেন কিন্তু কখনও স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হবেন না।

"আমার কোনো কাজ করা নেই
আমার কেবল বেকারভাতা –
বললে যখন, তখন বলি,
আড়িকাঠিদের হে বিধাতা,

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 15
Website: https://tirj.org.in, Page No. 120 - 129
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আমিই আমার খুনি এবং
আমিই আমার পরিত্রাতা।
আমি বরং শিরও দেব,
স্বধর্মকে কখনো না।”[১৫]

কবি গীতা চট্টোপাধ্যায় টুকরো টুকরো চিত্রকল্পের মধ্যে দিয়ে পূর্ণাবয়ব সমাজের চিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন। শব্দের আভ্যন্তরীণ অর্থকে এমনভাবে ব্যবহার করেছেন সেটি হয়ে উঠেছে মা দিদিমাদের রহস্যালাপ, রস-পূর্ণ। যার মধ্য দিয়ে নারী চরিত্র হয়ে উঠেছে বহুমাত্রিক। পৃথিবীতে একবার জন্মগ্রহণ করলে দুঃখ কষ্ট সবকিছুকেই গ্রহণ করে জীবনযাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। কারণ প্রবাহমানতাই জীবন, স্তব্ধতা নয়। কবির বিভিন্ন কবিতার মধ্যে আমরা দেখেছি মায়ের ভেতর থেকে একটি ছোট্ট প্রাণ কিভাবে পৃথিবীতে আসে, আবার অকালে চলেও যায়। সন্তান হারানোর ব্যথা মাতৃহৃদয় কিভাবে সহ্য করে সেটি কেবলমাত্র একজন নারীই বোঝে। এই শোকের কোন সান্ত্বনা হয় না। কেননা প্রাণ জন্ম যেমন বিস্ময়ের মৃত্যুও সেই রকম। একটি আনন্দ বহন করে অপরটি শোক। এইসব কিছুকেই তিনি নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছেন এবং নারী বলেই হয়তো বলতে পেরেছেন গেরস্থালিও কখনো কখনো কবিতা হয়ে ওঠে। 'কবিতা গেরস্থালি' কবিতাতে আশাপূর্ণা দেবীকে শ্রদ্ধা নিবেদনে তিনি জানান –

> “আশাপূর্ণা যেমন লিখেন তেমনটি ঠিক লিখতে পারলে গেরস্থালি কবিতা হয় এবং এক একটি কড়িবরগা, কবিতারও, মাছের আঁশ, ফুলদানি, চটের জমি সুতোর ফোঁড় ইত্যাদির সাথে এই কবিতায়... ভিজে হাতে মস্ত একটা খোঁপা বাঁধার অনুভূতি... ভেলভেটে মোড়া আলমারিতে কাচের পুতুল, ফরাসি মনমোহিনী ও গালার নিচে একটুখানি প্যারিস আঠা, এই সব কিছুকেই কবিতা নেয়।”[১৬]

অর্থাৎ সংসারের প্রতিটি উপকরণের মধ্যে কবিতা লুকিয়ে থাকে কিন্তু সেটিকে খুঁজে বের করে কবিতায় স্থান দেওয়া সহজ কথা নয়। কবিতা চট্টোপাধ্যায় ঠিক সেরকমই নানান অনুষঙ্গকে তাঁর কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। আলোচ্য কবিতায় রয়েছে ঘরে থাকা মেয়েদের অবস্থা, তাদের জীবনযাপন, তাদের হাতের কাজ, তাদের সেলাই শিল্প সবকিছুই। সাংসারিক অস্তিত্ব নারী অস্তিত্বের সঙ্গে তাঁর কবিতা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত-

“আশাপূর্ণা যেমন লেখেন তেমনটি কি লিখতে পারি?
মালা জপতে পেসাদ দিদি সংসারটা যেমন রাখেন...
অথবা ‘রোহিণী তুমি আমার কে’ বারুণী ঘাটে
সমস্ত কবিতা লেখো, কবিতা সমস্ত কারণ–
তেমনটি ঠিক নাই-বা হল আশাপূর্ণা লেখেন যেমন।”[১৭]

সাংসারিক অস্তিত্বের পাশাপাশি ইতিহাসের গভীরে থাকা অন্ধকার সমূহকে পাঠ করেছেন তাঁর জ্ঞান অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। এই অন্ধকারকেই জীবনে গ্রহণ করে সেটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছেন লেখিকা। সমাজের ষড়যন্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রের কুসংস্কারের গোড়ায় কুঠারাঘাত করেছেন তিনি। পুরুষকে মোহগ্রস্ত করা, দূষিত করাই যেন নারীর একমাত্র কর্ম - এমন শাস্ত্র উক্তি রয়েছে আমাদের সংস্কৃতিতে। নারীর সমস্ত শক্তি, মেধা, সামর্থকে তাঁরা উপেক্ষা করে নারী সম্পর্কে যে যে উক্তি করেছেন তা কবিতায় ফুটে উঠেছে –

“স্বভাব এষ নারীনাং নরাণামিহ দূষণম – মনুসংহিতা ২। ২১৩
— ইহলোকে পুরুষকে দূষিত করাই নারীর স্বভাব। ...
কে আমাকে নষ্ট করে দিস? –মনু বলেছেন, নারী।”[১৮]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 15
Website: https://tirj.org.in, Page No. 120 - 129
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আত্মশক্তিতে বলীয়ান নারীকে দেখে ভীত হয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। সেই ভীত হওয়ার জন্যই আতঙ্কিত পুরুষদের আশ্রয় শৃঙ্খল। নারী স্বতঃস্ফূর্ত সৌন্দর্যকে ভয় পাচ্ছে পুরুষ। শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রিয়কে নিরুদ্ধ করার মধ্যে পুরুষের আত্মপ্রতারণার দিকই উঠে এসেছে। তাহলে শেষ পর্যন্ত পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের প্রয়োজন। মনু যতই বলুন নারী পুরুষকে নষ্ট করে দেয় কিন্তু পুরুষের যদি আত্মসংযমবোধ জাগ্রত থাকে তাহলে তার কখনো পদস্খলন ঘটবে না-

"আকাশের ইন্দ্রধনু দেখিও না কখনো কারুকে
ও কি সব সত্যি নাকি ওই দিকে জীবন বিভ্রম
অঞ্জলিতে জল পান কোরো না গেরস্ত, নির্নিমিখে
কাজল পরবে নারী এখন দেখো না ওই দিকে।
মনুর গেরেস্ত তবু অন্য মনে দাঁতে কাটে নখ
কাজল পরছে রাত্রি, সেদিকেই পড়ে গেছে চোখ।"[১৯]

নারীকে কেন্দ্র করে বারবার সমাজ নানান ফতোয়া জারি করেছে। সমাজ নারীকে বারবার কোণ ঠাসা করে দিয়েছে স্বাধীনতা হরণ করছে। শঙ্করাচার্যের মতো ব্রহ্মবাদীদের কাছে নারীরা মায়া, ভ্রম তাই তারা ত্যাজ্য। একটি সংসারের নারীর যে ভূমিকা সেটাকেও প্রাচীনকালে শাস্ত্রজ্ঞ স্বীকার করতে চাইতেন না। তাঁদের কাছে নারী অবিদ্যা স্বরূপ কারণ তারা পুরুষকে মোহিত করে। কিন্তু সেই শাস্ত্রজ্ঞরা ভুলে যান সমাজে যদি নারী না থাকে তাহলে পরবর্তী প্রজন্মের সৃষ্টি সম্ভবপর নয়। এই প্রসঙ্গে কবির কৌতুক ও ব্যঙ্গের অমোঘ আঘাতে শাস্ত্রের সমস্ত নিয়মের বিনাশ ঘটে। কবিতায় আমরা দেখতে পাই ভিখারীর সঙ্গে নগ্ন পদে হেঁটেছেন শঙ্কর স্বয়ং। জৈব বাসনা ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি হয়ে উঠেছে মুখ্য। নারীকে যারা মায়া, ভোগ্য সামগ্রী বলে মনে করেছেন তারাই সমাজের অবিদ্যা। নারী হয়ে উঠেছে এদের মুক্তিদাত্রী—

"দুঃখে মাথা দিয়ে আছে, ঠিক জানো নারী, মায়া নয়?
অনন্ত শঙ্করাচার্য চেনেন না বিকেলের পরে।...
অবিদ্যা সে, বসে আছে রোজকার কড়ায় রেখে হাত
নরকের দ্বার থেকে কে ফেরাবে চৈতন্যবিভ্রম
মধ্যরাত্রে শোভাযাত্রা বৈরাগীর নগ্ন পদব্রজ
ষাঁড় ও ভিখিরি সঙ্গে বৈদান্তিক শঙ্কর স্বয়ং
অন্তর্গত মায়া নাকি তদুভয় অমৃত ও তাড়ি?
পাপের শহর দেখব, নরকের দরজা খোলো, নারী।"[২০]

নারী আমাদের মুক্তি প্রদান করলেও একটা সময় পর্যন্ত নারীকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হত। কৌলিন্য যুগে কোনো স্ত্রীর পতি বিয়োগ হলে তাকে স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় পুড়িয়ে মারা হত। এটাই ছিল তৎকালীন প্রথা। আলোচ্য কবিতায় কবি একজন নারীর মানসিক বেদনার চিত্রকেই প্রতীকায়িত করেছেন। উনিশ শতকে যখন নবজাগরণের সূচনার পরবর্তী সময় থেকে যখন রাজা রামমোহন রায়ের হাত ধরে পাস্তা শিক্ষার প্রচার এবং প্রসার ঘটলো, তখন ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় এই বর্বর প্রথাকে আইন করে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল। কবিতার শুরুতে আমরা মহাভারতের অনুষঙ্গ পাই। মহাভারতের স্বর্গরোহন পর্বে একটি কুকুর, যুধিষ্ঠির সহ পঞ্চপান্ডব ও দ্রৌপদী স্বর্গের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। যুধিষ্ঠিরের বাকি চার ভাই ও পত্নী দ্রৌপদী স্বর্গ যাত্রাপথেই মারা গিয়েছিলেন ইহজীবনকৃত কোনো পাপে। যুধিষ্ঠির শেষ পর্যন্ত স্বর্গে যেতে পেরেছিলেন এবং কুকুরটি ছিল তাঁর পথপ্রদর্শক। কুকুর যেমন যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গে যাওয়ার পথ নির্দেশ করে পথপ্রদর্শকের কাজ করেছিল কবিতাতেও তেমনি নারী পুরুষকে স্বর্গের পথপ্রদর্শকের কাজ করেছেন সহমরণের অঙ্গ হয়ে। চোখের চোয়ানো জল যেন সেই বৈতরণী নদীর সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। বৈতরণী নদী হল ভবসংসার ও পরপারের মধ্যবর্তী সেতু। এখানে তাদের ব্যক্তিগত জীবন প্রাধান্য পাচ্ছে না। তারপরই কবি সমাজের কর্তা ব্যক্তিদের বিষ পিঁপড়ের

সঙ্গে তুলনা করেছেন। যারা প্রথা নিয়মের দোহাই দিয়ে অন্যায় চালিয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। ঠিক যেভাবে বিষ পিঁপড়ে একটি সতেজ জামরুল গাছকে নষ্ট করে দেয়। সহমরণের যে নারীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সে যদি ফিরতে চায় তার পরিবার-পরিজনের কাছে অর্থাৎ স্বাভাবিক জীবনস্রোতে, তাহলে সমাজে বিষ পিঁপড়ে রূপী মানুষ তাদের শক্ত মুঠির দ্বারা মৃত্যুকেই নিশ্চিত করে দেয়। তারপর সেই নারীকে স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় উঠানো হল এবং জ্বলন্ত চিতায় অগ্নিসংযোগের মধ্য দিয়ে বর্তমান থেকে স্মৃতিতে মিলিয়ে গেল। শেষে গিয়ে কবি আমাদের এই বার্তাই দিলেন যে নারী ছাড়া সবকিছুই অচল। সেই নারীকে শাস্ত্রজ্ঞরা অবিদ্যা বলে দাগিয়ে দিলেও শেষ পর্যন্ত নারী বদ্ধ পুরুষের মুক্তিদাত্রী। নারী উত্তরণকারী। নারীবাদ গভীরতার অর্থে বেদনা ও উত্তরণের মধ্য দিয়ে মিশে আছে কবিতায়–

> "চোখের চোঁয়ানো রেখা, ওই তোর বৈতরণী নদী...
> এইখানে তাহ হবি, এবার চিতায় আরোহণ
> এইখানে দাহ হবি, এবার স্মৃতিতে আরোহণ
> এইখানে দাহ হবি, – রক্ত ওষ্ঠ, তামরস - নাভি
> মুখের কাপড় তুলে শেষ দেখা দেখ, তোর স্বামী।"[২১]

কবিতার সামগ্রিক আলোচনার মধ্য দিয়ে বলা যেতে পারে ছয়ের দশকের কবি গীতা চট্টোপাধ্যায় মূলত বিষয় প্রধান কবিতা লিখেছেন। বহু শতাব্দী ধরে প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী পুরুষ নিজের ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠা করতে, সর্বেসর্বা হয়ে ওঠার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করেছে এবং নিরন্তর নারীদের অবদমিত করার চেষ্টা বহাল রেখে চলেছে। লেখিকা শ্লেষের সুরে জানিয়েছেন দিনের বেলা যে নারীকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে রাত্রিবেলা তাকে ভোগ করতেও পিছপা হন না। কবি দেখিয়েছেন তাঁর বিভিন্ন কবিতার মধ্য দিয়ে যে নারী কিভাবে দেবীতে রূপান্তরিত হয়। তিনি স্বদেশমাতৃকাকে দেবী দুর্গার বহুমাত্রিক রূপের সঙ্গে একাত্ম ঘটিয়ে নারী, নদীকে মিলিয়ে মিশিয়ে এক বৃহৎ ক্ষেত্র তৈরি করেছেন। কোনো অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে নয় নিজের জীবন দিয়ে যে সকল অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন সেগুলিকেই কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। বলা বাহুল্য তৎকালীন সমাজের পর্দানসীন নারীর পর্দামুক্তি ঘটিয়েছেন আপন সৃজনে।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, তপোধীর, 'নারীসত্তা: নারীর ভুবন', 'নারীচেতনা মননে ও সাহিত্যে', প্রথম বঙ্গীয় সং, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ফেব্রুয়ারি, ২০২২, পৃ. ১৩
২. বসু, বুদ্ধদেব (অনু), 'স্তোত্র', 'বোদলেয়ার তাঁর কবিতা', প্রথম দে'জ সং, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, অক্টোবর, ২০১৯, পৃ. ১৭১
৩. সিংহ, কবিতা, 'ভ্রূণা', 'কবিতা সিংহের শ্রেষ্ঠ কবিতা', চতুর্থ সং, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি, ২০২০, পৃ. ১২৪
৪. সেনগুপ্ত, মল্লিকা, সরকার, সুবোধ (সম্পা.), 'ছেলেকে হিস্ট্রি পড়াতে গিয়ে', 'কবিতা সমগ্র', চতুর্থ মুদ্রণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ডিসেম্বর, ২০১৮, পৃ. ৩৬১
৫. চট্টোপাধ্যায়, চৈতালি, 'একটি হত্যাকাণ্ডের পর', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', দ্বিতীয় সং, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ফেব্রুয়ারি, ২০১৬, পৃ. ৮৩
৬. সেনগুপ্ত, সুতপা, 'প্রাকৃত', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', প্রথম সং, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল, ২০১৭, পৃ. ২৭
৭. মন্ডল, গৌতম (সম্পা.), 'আদম সম্মাননা সংখ্যা', কলকাতা, আদম, ডিসেম্বর, ২০১৬, পৃ. ৪৯
৮. চট্টোপাধ্যায়, গীতা, 'কবিতা সংগ্রহ', কলকাতা, আদম, জানুয়ারি, ২০১৬, ভূর্জপত্র (১)
৯. প্রাগুক্ত
১০. চট্টোপাধ্যায়, গীতা, 'কর্তার ঘোড়া দেখে রাসসুন্দরী', 'কবিতা সংগ্রহ', কলকাতা, আদম, জানুয়ারি, ২০১৬,

পৃ. ১৫৯
১১. প্রাগুক্ত
১২. চট্টোপাধ্যায়, গীতা, 'ঘর হৈতে আঙিনা বিদেশ', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮
১৩. চট্টোপাধ্যায়, গীতা, 'শিল্পসত্য', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০
১৪. চট্টোপাধ্যায়, গীতা, 'জন্ম', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭
১৫. চট্টোপাধ্যায়, গীতা, 'ধর্ম', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯
১৬. মন্ডল, গৌতম (সম্পা.), 'আদম সম্মাননা সংখ্যা', কলকাতা, আদম, ডিসেম্বর, ২০১৬, পৃ. ১১৮
১৭. চট্টোপাধ্যায়, গীতা, 'কবিতার গেরস্থালী', 'কবিতা সংগ্রহ', কলকাতা, আদম, জানুয়ারি, ২০১৬, পৃ. ১৭৫
১৮. চট্টোপাধ্যায়, গীতা, 'মনু বললেন, নারী', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪
১৯. চট্টোপাধ্যায়, গীতা, 'মনুর গেরস্ত', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫
২০. চট্টোপাধ্যায়, গীতা, 'নরকের দ্বারী, নারী', প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮
২১. চট্টোপাধ্যায়, গীতা, 'সতীদাহ', প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫